Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম প্যারেন্টিং

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাজেদা পারভীন

রোলঃ 228020137

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম প্যারেন্টিং

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাজেদা পারভীন

রোলঃ 228020137

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম প্যারেন্টিং " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাজেদা পারভীন, আইডিঃ 228020137 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম প্যারেন্টিং " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাজেদা পারভীন

(স্বাক্ষর)

সাজেদা পারভীন

আইডিঃ 228020137

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্যারেন্টিং কি.....5

প্যারেন্টিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য.....6

ইসলামিক পদ্ধতিতে প্যারেন্টিং এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিশুর মধ্যে যেসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন.....7

ইতিবাচক প্যারেন্টিং ও দুর্বল প্যারেন্টিং.....11

প্যারেন্টিং পদ্ধতি.....15

সার্থক প্যারেন্টিং এর করণীয়.....16

পেরেন্টিং এর ধাপ বা পর্যায় সমূহ.....18

শৈশবকাল.....21

পারিবারিক পরিবেশ :.....27

শিশু মানসে ঔশৃংখলতা: কারণ ও প্রতিকার.....30

উশৃংখলতার কারণ ও প্রতিকার :.....31

কৈশোরের কৌতুহল ও কোলাহল.....33

বিরাট পরিবর্তন.....34

অন্যান্য বিষয়.....35

বিদ্যালয় ও ক্যারিয়ার.....38

ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়ার কারণ :.....40

তারুণ্য জীবনের ক্রান্তিকাল (১৮-২১).....43

তরুণদের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব.....44

উপসংহার.....47

নোট :.....47

প্যারেন্টিং কি

প্যারেন্টিং একটি মহৎ,মহান, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার নাম। এ প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতা সন্তানের জন্ম মুহূর্ত থেকে তার শারীরিক,মানসিক,নৈতিক,আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিজ সত্তা, স্রষ্টা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

সন্তান আল্লাহতালার পক্ষ থেকে পিতা মাতার প্রতি আমানতস্বরুপ।এই আমানতের খেয়ানত করা - আল্লাহর দেওয়া আমানতের খেয়ানত করা। তাই এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে যথোপযুক্ত উপায়ে সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে সন্তান প্রতিপালনের কাজটি সম্পাদন করতে চাইলে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির আশা পোষণ করার জন্য সর্বাগ্রে সন্তান লালন পালনের প্রকৃতি,এর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে সম্মুখ ধারণা লাভ করতে হবে।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য সন্তানকে তার মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নৈতিক,আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের একজন ভালো মানুষ ও আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা।

প্যারেন্টিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিটি কাজের এই নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। প্যারেন্টিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সন্তানকে জাগতিক ও পরলৌকিক জীবনের জন্য যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

সন্তান আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামত। আল্লাহর যেকোনো নিয়ামতি যত্ন করে ধারণ ও লালন করতে হবে। অসচেতনতা ও গাফিলতির জন্য আল্লাহর নেয়ামত ধ্বংস হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ভুল ও সারা জীবনের কান্না হয়ে দাঁড়ায়। আবার এমনও নয় যে নিজের সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু সন্তানের পেছনে সময় দেওয়া। সর্বাগ্রে নিজেকে মহান আল্লাহ তায়ালার জিকির ও রাসুলের আদর্শকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সন্তানকে লালন পালন করতে হবে। যেন সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত পেরেশানি আমাদের আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ করতে না পারে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

ওহে যারা বিশ্বাস করো তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে না সরিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি তা করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

অবস্থায় আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থাকতে হবে। এছাড়া সন্তানের ভালো গুন গুলো ও খারাপ গুণগুলো লোকের কাছে বলে না বেড়ানো এবং ভালো গুণের জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করা। খারাপ গুলোর জন্য আল্লাহর নিকট পানা চাওয়া।সর্বদা সন্তানের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

ইসলামিক পদ্ধতিতে প্যারেন্টিং এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিশুর মধ্যে যেসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন

১.নৈতিকতা :প্যারেন্টিং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সন্তানকে তার কথা কাজে ও চিন্তা চেতনায় নৈতিকতা সৃষ্টি করা। মূল্যবোধ অনৈতিকতা মানুষের উত্তম চরিত্র গঠন ও প্রকাশে সাহায্য করে। মহৎ চরিত্রা গঠিত হয় কথা ও কাজে, ভদ্রতা,ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, কৃতজ্ঞবোধ, সহানুভূতি, স্পষ্টবাদীতা প্রভৃতির মাধ্যমে;যা কারো ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হয় না।ওই ব্যক্তি মহৎ চরিত্রের অধিকারী যে কঠিন পরিস্থিতিতেও দান করে এবং অপরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। রাসূল সা: এর চরিত্র কতটা অনুকরণীয় ছিল সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য তার জীবনী অধ্যয়ন খুবই জরুরী।জীবনে এই ধরনের শিষ্টাচার রক্ষা করা যাতে আমাদের সন্তানরা উত্তম চরিত্রের গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

২.সততা: সততা ও ন্যায়পরায়নতা মানুষের একটি মহৎ গুণ। এ মহৎ গুণের প্রতিফলন ঘটাতে হলে পিতা-মাতাকে হতে হবে রোল মডেল। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় তারা যা দেখে তাই শিখে। পিতা নিকট সততা আশা করাটা অবাস্তব। শিশু মনের সততার বীজ বপন করতে হলে শিশুদের সৎ ব্যক্তিদের গল্প শুনানো ও এর পুরষ্কার সম্পর্কে অবহিত করা। কোন কাজগুলো সৎ কোনগুলো অসৎ পার্থক্য করে দেওয়া এবং সৎ কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করা।

৩.দায়িত্ববোধ: শিশুকে দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। শিশুই দায়িত্ববোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অভিভাবকের নির্বুদ্ধিতার কারণেই শিশুর এই গুনটি বাস্তবে রূপান্তরিত হয় না। এ লক্ষ্যে শিশুকে তার বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিয়ে তার কাজের প্রশংসা করা এবং কাজে ব্যর্থ হলে তিরস্কার না করে বুঝিয়ে দেওয়া। এ সম্পর্কে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন রাসূল সা: বলতে শুনেছি, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহিতা করবে।পুরুষ তার

পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল অতএব দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। রিতার স্বামী গৃহের দায়িত্বশীল কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪.আইনের শাসন মানা: প্রতিটি পরিবারেরই নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করে নেওয়া হতে পারে সেটা জাগতিক বা পরলৌকিক। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পিতা-মাতার সন্তানের সাথে এমন সম্পর্ক তৈরি করতে হবে যাতে সে তার সব কথা ব্যক্ত করতে পারে। অনেক সময় অতিরিক্ত শাসনের কারণে সন্তান ভুল করলেও ভয়ে পিতা-মাতার নিকট গোপন করে ফলে তারা বিপথগামী হয়। এজন্য শাসনের মাত্রা অনুযায়ী শাসন করতে হবে। মতের ব্যতিক্রম হলে তার উপর চাপিয়ে না দিয়ে ওই বিষয়ের সুযোগ সুবিধা তার সামনে তুলে ধরা এবং বুঝানোর মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করা।

৫.অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন : হযরত মুহাম্মদ সা: বলেছেন, "সেই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের হক আদায় করে না।"অর্থাৎ যার যতটুকু অধিকার রয়েছে তাকে সেটা প্রদান করতে হবে। এজন্য শিশুদের শেয়ার করে খেতেও খেলতে শেখানো। দাস-দাসীদের সাথে উত্তম আচরণের শিক্ষা দেওয়া। অনেক পিতা-মাতা বিশেষ কোন খাবার নিজেরাও খায় না অথবা বড় সন্তানকেও দেয় না। এতে ওই বাচ্চাটা শুধু নিজের অধিকারটাই বুঝে অন্যের অধিকার বোঝে না। পরবর্তীতে সে একজন স্বার্থপর সন্তান হিসেবে বড় হয়। যার যতটুকু তার ততটুকুই সমকন্টন করে ভোগ করা উচিত। ইসলামী জ্ঞানের অভাবে আমাদের সমাজে ভাই বোনদের প্রাপ্য সম্পত্তি দিতে চায় না। অধিকাংশ মেয়েরা তাদের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে তারা বঞ্চিত হয়। পিতা-মাতার উচিত এ ব্যাপারে সচেতন থাকা।

৬.সঞ্চয় ও বিনিয়োগের চেষ্টা করানো : ছোটবেলা থেকেই শিশুদের সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তোলা। এজন্য তাদের মাটি বা অন্যান্য বস্তুর ব্যাংক কিনে দেওয়া। এতে তাদের মধ্যে জীবন বোধ সৃষ্টি হবে। অর্থেক প্রয়োজনীয়তা অনুভব এবং

অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে। একটা নির্দিষ্ট বয়সে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া যাতে তারা সফল উদ্যোক্তা হতে পারে। হযরত মুহাম্মদ সা: ব্যবসা পছন্দ করতেন।

৭.কঠোর পরিশ্রম : শিশুদের পরিশ্রমী করে গড়ে তুলতে হবে। এতে শিশুর ও লাভ পিতামাতার ও লাভ। সে কোন কাজকে ছোট মনে করবে না। সে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। বড় হলে সে একজন সফল মানুষে পরিণত হবে। এজন্য শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দেওয়া। কিন্তু খুব কম পিতামাতাই এ কাজ করে থাকেন। এর নিজে হাতে খাওয়াটা উপর পর্যন্ত শেখান না।বর্তমানে পিতামাতা সন্তানকে অতিরিক্ত আহ্লাদে বড় করার কারণে সন্তান অথর্ব হয়ে বেড়ে ওঠে। তাদের মানসিক বিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে এর প্রভাব প্রতিটি পিতা-মাতার ওপরে পড়ে।

৮.ভালো কাজ করার ইচ্ছা :শিশুরা অনুকরণ প্রিয় পিতা-মাতা ভালো কাজ করলে সন্তানও ভালো কাজ করবে। শিশুদের মধ্যে এই গুণের বিকাশ ঘটানোর জন্য ভালো কাজের সুফল সম্পর্কে অবহিত করতে হবেওপ্রশংসা করতে হব। ভালো কাজ করলে পুরস্কৃত করতে হবে। এতে তারা একজন সত্যবাদী, সহমর্মী, নিষ্ঠাবান ও সামাজিক মানুষ হিসেবে গরে উঠবে। উদার ও মহান ব্যক্তি হিসেবে ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত হবে ইনশাআল্লাহ। তার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, আল্লাহর কাছে সে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ যে মানুষের বেশি উপকারে আসে।

৯.সময়নিষ্ঠা:প্রত্যেকেরই শৃঙ্খলাপুর্ণ জীবনযাপন করা উচিত। এজন্য থাকা প্রয়োজন সময় নিষ্ঠা। এরউপর নির্ভর করে সুস্থতা ও সফলতা। কথায় আছে সময়ের এক ফোড় অসময়ের নয় ফোড়।এ গুরুত্বপূর্ণ গুনটি শিশুর মধ্যে প্রতিফলন ঘটাতে হলে অভিভাবককে সচেতন হতে হবে। বর্তমানে ডিভাইসের যুগে মানুষের জীবন যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। কম্পিউটার, মোবাইল, টিভি এসব ডিভাইস আসক্তির ফলে মানুষের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। তাই সময়ের সৎ ব্যবহার চ্যালেঞ্জের মুখে পতিত হচ্ছে। সচেতন পিতা-মাতারউচিত শিশুর ঘুম, খাওয়া ও গোসলের সময়

নির্দিষ্ট করে দেওয়া।সাত বছর হলে সিজদার অভ্যাস তোলা এবং কোরআন তেলাওয়াতেরঅভ্যাস গড়ে তোলা।

১০.মুত্তাকী করে গড়ে তোলা : প্রতিটি শিশুই নিষ্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পিতা-মাতা তাকে যে ধর্মবিশ্বাসে গড়ে তোলেন তারা সে ধর্মেরই অনুসরণ করে। শিশুরা হচ্ছে কাদামাটির মত কাদামাটি কে যেমন যেকোনো আকৃতিতে তৈরি করা যায় তেমনি শিশুদের কেউ যেভাবে বুঝানো হয় সে তাই বিশ্বাস করে, ধারণ করে ও লালন করে।এ জন্য শিশু মনে আল্লাহর নির্দেশি অনু শাসন অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া। বেহেস্ত ও দোযখ,

হারাম হালাল সম্পর্কে রওনা দেওয়া। উত্তম আচরণের শিক্ষা দেওয়া। শিশু কান্না করলে কোরআনের অ্যাপ চালু করে রাখা। নবী রাসুল সাহাবাদের জীবনী তারে শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো। "হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর আর তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" সূরা আল ইমরান ১০২

১১.অনুশোচনা : "যারা অজ্ঞানতাবশত খারাপ কাজ করে। তারপরে অনুশোচনা করলে ও নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক আর ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" সূরা নাহল ১১৯

প্রতিটি মানুষেরই ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস থাকা উচিত। কারণ ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে ক্ষমাকারীর মন বিগলিত হয় ক্ষমা প্রার্থীর মন প্রশান্ত হয়। দুই ধরনের হক রয়েছে । ১,আল্লাহর হক ২,বান্দার হক। আল্লাহর হুকুম আহকামের ঘাটতি থাকলে আল্লাহর নিকট তওবা করলে ইচ্ছে করলে ক্ষমা করেও দিতে পারেন। পক্ষান্তরে বান্দার হক বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। তার মধ্যে অন্যায়ের অনুভূতি তৈরি না হয় তবে সে অনুশোচনা করবে না, ক্ষমাও প্রার্থনা করবে না। এজন্য শিশু কোন ভুল বা অন্যায় করলে প্রশ্রয় না দিয়ে তাকে বোঝানো এ ভুল বা অন্যায়ের ফল কি হতে পারে। এভাবে তার মধ্যে ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তোলা। এতে সে মানুষকে সম্মান করতে শিখবে ন্যায় অন্যায় বোধ সৃষ্টি হবে এবং একজন কোমল হৃদয়ের নম্র ও ভদ্র মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

ইতিবাচক প্যারেন্টিং ও দুর্বল প্যারেন্টিং

*ইতিবাচক প্যারেন্টিং :এটি একটি সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা। বাগানের চারা গাছ আর বিদ্যালয় এর নার্সারির শিশুর মধ্যে চমৎকার একটা মিল রয়েছে। চারা গাছের যথাযথ পরিচর্যা করা হলে একদিন ফুলে ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষে রূপ নেয়। তেমনি শিশুর যথাযথ পরিচর্যা করা হলে সে পর্যায়ক্রমে একজন সকল ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। আমাদের মনে রাখতে হবে উন্নতমানের খাবার, বাসস্থান প্রদান করার মাঝে কেবল সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়

বরং সন্তানদের সহমর্মিতা প্রদান তাদের সাথে বোঝাপড়া মানসিক সাহায্য তাদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি এবং তাদের এই পৃথিবীতে চলার মত যোগ্যতা সম্পন্ন গড়ে তোলাও সন্তান পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পিতা মাতার মূল দায়িত্ব হল পরিবারের মধ্যে একটি শান্ত নিরাপদ ও সহযোগিতা পূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা। মনে আত্মবিশ্বাসের যোগান এবং তাদের হৃদয় ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে ভালোবাসার আলোক ছটা সমাজের অন্য মানুষদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে

পারে।সন্তান যদি সৎ গুণাবলী সম্পন্ন হয় তাহলে এর ফলাফল পুরু সমাজ ভোগ করে। কঠোর পরিশ্রম এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে অর্জন করা সম্ভব। একক পরিবারের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয় বরং এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রত্যেক পরিবারের জোর প্রচেষ্টা। সচেতন পিতা-মাতা অল্প বয়স থেকেই সন্তানদের সাথে মেলামেশা করে যেকোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে ক্ষেত্রে তাদেরকে যোগ্য সঙ্গ দেয়। তাদের মাথায় পরশ বুলিয়ে দেয়। যখন সন্তানের সাহায্যর প্রয়োজন অনুভব করে তখন পরিবারকে তারা আন্তরিক সমভাবাপন্ন ও সহায়ক হিসেবে পাশে পায়।সন্তান প্রতি পালন আর দশটা সৃজনশীল প্রচেষ্টার মতো একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। কিন্তু এটি সহজ হয়ে যায় যখন পিতা-মাতা সন্তানদের পার্টনার হিসেবে বিবেচনা করে। এমন পার্টনার যাদের সাথে মতদ্বন্দ্বের পরিবর্তে একসঙ্গে কাজ করা যায়। সচেতন পিতা-মাতা কোন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অগ্রিম পদক্ষেপ নেয় এবং জটিল আকার ধারণ করার আগেই সমাধানের ব্যবস্থা করে। সন্তানদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তারা রাগান্বিত ও কঠোর হওয়ার পরিবর্তে কোমল ও অমায়িক হয় তাদের সাথে দূরত্ব তৈরি পরিবর্তে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে।

সন্তানদের সামাজিক করে গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি একজন অভিভাবক নিজে সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে বাকি ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।

*দুর্বল প্যারেন্টিং :সার্থক প্যারেন্টিং এর বিপরীত হলো দুর্বল পেন্টিং। দুঃখজনক হলেও সত্যি বর্তমান সময়ে অধিকাংশ পিতা-মাতা সন্তানের ক্যারিয়ার গড়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। সন্তানদের আধ্যাত্মিক চাহিদাকে তারা তুচ্ছ মনে করে
অথচ প্রত্যেকেই তার কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সন্তানকে আধ্যাত্মিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে পিতা মাতার এত পেরেশানি হত না।

শৃঙ্খলিত জীবনযাপন করার মাধ্যমে একটি কল্যাণকর ও বরকতময় জীবনের আচ্ছা দন করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু অভিভাবক রয়েছে যারা অধিকাংশ সময় অনলাইনে ব্যস্ত থাকে অথবা ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকে সন্তানের দিকে খেয়াল করার সময় নেই। শ্রমজীবী মায়েদের তো কথাই নেই।

শ্রমজীবি মায়েরা দুধের শিশুকে পর্যন্ত আত্মীয় অথবা কোন শিশু পালন কেন্দ্রে দিয়ে রাখে। এতে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের ঘাটতি দেখা দেয় এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে। এতে শিশুরা এক সময় বিপথগামী হয়।

নিম্নে দুর্বল প্যারেন্টিং এর কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো :

অজ্ঞতা: অধিকাংশ পিতামাতাই সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি সম্পর্কে জানেনা। অনেক পিতা-মাতা মনে করে সন্তান আপনি সবকিছু শিখে নিবে।সৎ চরিত্রের অধিকারী হবে। এরূপ ধারণা পোষন করার ফলাফল খুবই মারাত্মক। সন্তান প্রতিপালন গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব। যা জীবনের অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ দিকের মতই সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কঠোর পরিশ্রমের দাবি রাখে। এই বিষয়টি কে অগ্রাহ্য করার অর্থ হলো সন্তানদের ভবিষ্যৎ কে বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া। পিতা মাতাকে অবশ্যই মৌলিক দুটি বিষয় অর্জন করতে হবে :

১,সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাতে সন্তানদের আল্লাহর ইবাদতের জন্য সর্বোচ্চ উপায়ে গড়ে তোলা যায়।

২,সমাজ ও সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা, যাতে সন্তানদের আদর্শ নাগরিক রূপে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

আত্মতুষ্টি :পিতা-মাতার তো অতিরিক্ত আত্মতুষ্টির ফলে সন্তানরা বিপথে যেতে আরে পিতা-মাতা যখন শিশু সন্তানের অসৎ সংগ মাদকাসক্তি এবং সমাজ বিরোধী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার খবর শুনতে পায় তখন তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাবে আমার সন্তান এগুলো করতেই পারেনা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিপদ সকল সকল জায়গায় জায়গায ছড়িয়ে আছে এবং আর নেটের সহজলভ্যতার কারণে এই সকল বিপদ আমাদের ঘরে এসেও হানা দিচ্ছে। তাই সন্তানদের উপযুক্ত বয়সে সকল ধরনের সম্ভাব্য বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে এবং এ ব্যাপারে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। তবে সন্তানদের সর্বদা সন্দেহের চোখে না দেখে বিশ্বাসের চোখে দেখতে হবে।

উদাসীনতা :উদাসীনতার কারণে অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের পথের দিকে ঠেলে দেয়। অথবা আমাদের যোগ্য রূপে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। পিতা মাতাকে সন্তানের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। অনেক পিতা-মাতা গা ছাড়া ভাবে দায়িত্বহীন ভাবে থাকেন। তারা ভাবেন যা হবার তা প্রকৃতিগতভাবেই হবে। এতে সন্তানরা অনেক সময় বিপথগামী হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে সন্তানদের একটা ভালো-মন্দ চরিত্র আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। যদি পিতা-মাতা শৈশব কাল থেকেই সন্তানের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে সচেতন না হয়, তাহলে চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। সূচনা লগ্ন থেকেই সার্বিক ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতার ঘাটতি :নতুন পিতা-মাতার মধ্যে অবধারিতভাবেই অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকে। কিন্তু এটাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে বসে থাকার ভুল করার সুযোগ নেই।কারণ আমরা যে সমাজে বাস করি যেখানে এই ব্যাপারে অসংখ্য তথ্য ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে নতুন পিতা-মাতা নিজেদের শৈশবকালে প্রতিপালিত

হওয়ার স্মৃতি এবং সমাজের অন্যান্য অভিজ্ঞ অভিভাবকদের নিকট সন্তান প্রতিপালনের উপায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

পূর্ব-পুরীদের অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণ :সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি অবস্থান ও পরিবেশ ভেদে কিছুটা পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে পুরাতন কে সর্বশাকুল্যে আঁকড়ে না ধরে যুগোপযোগী পদ্ধতি অবলম্বন জরুরী। এতে প্যারেন্টিং প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যায়। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সকল মুসলিমের লক্ষ্য ও প্রেরণা একই দিকে নিবদ্ধ। তবুও আমরা যে সমাজে বসবাস করি সে সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতির অনুসরণে শ্রেয়। এক মুসলিম প্রবাসে অবস্থান করেন সেখানকার অবস্থান ও পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক্ষেত্রে তাদের পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতি নতুন পরিবেশে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে ইসলামী হিকমা অনুযায়ী সন্তান লালন-পালন করতে হবে।

পারিবারিক বিপদ: দুর্ঘটনা, অর্থাভাব ওদুর্ভাগ্য কোন ধরনের সতর্কবার্তা ছাড়াই একটি পরিবার কে গ্রাস করে নিতে পারে। যা বেদনা এবং দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের কারণ হতে পারে। যে কোন ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যা অভিভাবকের ওপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করে। সন্তান প্রতিপালনের মত কঠিন ও ভারী দায়িত্ব কেবল একজন অভিভাবকের কাঁধে পড়ার কারণে সন্তানরা অনেক সময় নিজেদের অবস্থান হারিয়ে ফেলে।

জীবনের চাপ :আধুনিক জীবন ব্যস্ত ও কঠিন চাপের জীবন। আর্থিক ও ক্যারিয়ার সংক্রান্ত এবং বাস্তবতার কারণে অভিভাবক দিশে হারিয়ে ফেলে। অনেকগুলো দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

প্যারেন্টিং পদ্ধতি

যেহেতু প্যারেন্টিং একটি সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। নিম্নে প্যারেন্টিং এর প্রধান তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

কর্তৃত্বপূর্ণ প্যারেন্টিং :এই ধরনের প্যারেন্ট্রা খুব কট্টরপন্থী হয়। এখানে সন্তানের মতামতের কোন গুরুত্ব থাকেনা। নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে সন্তানরা কোন কিছু ভাবতে পারেনা । তারা যেভাবে বলবে সেভাবেই তাকে চলতে হবে। এ পদ্ধতিতে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। সন্তানের কোন স্বাধীনতা থাকে না। এতে তাদের নিজস্ব সত্তার বিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়।সন্তান নিজেকে গুরুত্বহীন ভাবে। এতে সে একজন কঠোর হৃদয়ের মানুষে পরিণত হয়। কিন্তু পিতা-মাতা এর নিকট সম্পূর্ণ সফলতা আশা করে।

অনুমতি মূলক :এ পদ্ধতিতে সন্তানকে প্রায় ছেড়েই দেওয়া হয়।সে যেভাবে চায় সেভাবে চলতে পারে তার অনুমতি দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে একটু আকটু খোঁজখবর রাখেন। পরিবারের সন্তানকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়ার কারণে সন্তান স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে গড়ে ওঠে। এছাড়া পিতা-মাতার দায়বদ্ধতার অভাবে সন্তান ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে কোন আবেগিক সম্পর্ক থাকে না। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে এই পদ্ধতি বিদ্যমান।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্যারেন্টিং :এই পদ্ধতি সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য উপায়। এখানে পিতা-মাতা কর্ত্রী পক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং বেঁধে দেওয়াসীমা অনুযায়ী শিশুরা চলাফেরা করে।   এই পদ্ধতি গড়ে ওঠে সন্তান ও অভিভাবকের মাঝে পরামর্শ, নমনীয়তা ও সুসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে।সচেতন অভিভাবক সন্তানদের পরিচালনা করেন বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে উচ্চ-বাচ্চ ছাড়াই। সন্তানদের উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার পরিবর্তে সন্তানদের কাছে এর কারণ ব্যাখ্যা করেন কোন প্রকার চিৎকার চেঁচামেচি না করে

তারা সন্তানদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেন জন্য এমন এক পরিবেশ তৈরি করেন যেখানে তারা নিজের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র ও আত্মমর্যাদা প্রকাশের সুযোগ পায় এমন ভাবে নিজেদের স্বকীয়তা প্রকাশ করে সম্মান বজায় থাকে এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশিত হয়।

সার্থক প্যারেন্টিং এর করণীয়

যোগ্য সঙ্গদান ও তদারকির মাধ্যমে সন্তানদের যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করা ও আখিরাতের সফলতার জন্য যোগ্য করে তোলার নাম সার্থক প্যারেন্টিং। সার্থকপেরেন্টিং এর জন্য পিতা-মাতার বিশেষ কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

১.উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া।

২.শিশুকে ধৈর্য ও ধীরস্থিরতার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৩.উদারতার শিক্ষা দেওয়া।

৪.প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।

৫.বাবা যে কাজে নিষেধ করেন মাকেও সে কাজে নিষেধ করা।

৬.পিতা-মাতার ভিন্ন মত থাকলে সেটা সন্তানের সামনে প্রকাশ না করা।

৭.সন্তানের বাবা মায়েরপরস্পরের প্রতি সম্মান দেখানো। এতে সন্তান পার্কের মূল্য বুঝতে শিখে ও তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সি বৃদ্ধি পায়।

৮.সংসারের কিছু গৃহস্থালী কাজ করানো তার দায়িত্ববোধ ও ডিসিপ্লিন শিখে।

৯.সন্তানকে কোয়ালিটি টাইম দেওয়া ও তার সাথে খেলাধুলা করা।

১০.সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট তাই মনোবাক্যে দোয়া করা।

১১.পরিমিত খাবার ও পানীয় গ্রহণে অভ্যস্ত করা

১২.পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রামে অভ্যস্ত করা।

১৩.হালাল উপার্জন করা। কারণ হারাম খাবার পেটের নিউরনকে ধ্বংস করে দেয়।

১৪.রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা

১৫.মতবিনিময় করা

১৬.ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করা

১৭.এমন সম্পর্ক তৈরি করা যাতে সে তার সব কথা ব্যক্ত করতে পারে। অনেক সময় বাবা সন্তানকে মারধর ও ধমকের উপর রাখে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটে।

১৮.ভুল করলে শাসনের মাত্রা অনুযায়ী শাসন করা।

১৯.শিশুকে স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করার সুযোগ দেয়া। এতে তাদের সৃজনশীল ক্ষমতা প্রখর হবে।

২০.মতের ব্যতিক্রম হলে তার উপর চাপিয়ে না দিয়ে ওই বিষয়ের সুযোগ সুবিধা তার সামনে তুলে ধরা এবং বুঝানোর মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ।

২১,ভালো কাজের প্রশংসা করা।

২২.সন্তানকে সব সময় সাহস দেয়া, আশাহত না করা।

২৩.সব সময় ইতিবাচক কথা বলা।

২৪.কথার সাথে কাজের মিল রাখা।

২৫.সন্তানকে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করার শিক্ষা দেওয়া।

২৬.দাস দাসীদের সাথে উত্তম আচরণের শিক্ষা দেওয়া।

২৭.সন্তানকে কুরআন শিখানোর তাগিদ দেওয়া।

২৮.মানুষকে খাওয়ানো ও সালাম দেওয়ার অভ্যাস করা।

২৯.অন্যের নিয়ামত দেখলে খুশি হওয়া এবং এবং গিফট দেয়ার অভ্যাস করা

৩০.সন্তানকে মিশুক করে ও সামাজিক করে গড়ে তোলা।

৩১.সন্তানের সাথে উচ্চস্বরে কথা না বলা।

৩২.প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় তার বৈশিষ্ট্য ও তাকে পরিচালনা করা।

৩৩.সন্তান বেশি কান্নাকাটি করলে কুরআনের অ্যাপ চালু রাখা।

৩৪.সন্তানের সামনে পর চর্চা না করা।

৩৫.আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ।

৩৬.সুন্নাহ ভিত্তিক জীবনযাপন করার তারবিয়াত করা।

৩৭.অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়া।

৩৮.সাত বছর বয়স হলেই সিজদা অর্থাৎ নামাজের তাগিদ দেওয়া এবং বিছানা আলাদা করে দেওয়া।

৩৯,মাঝে মাঝে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া।

৪০.শিশুকে স্পর্শের মাধ্যমে আদর করা।

পেরেন্টিং এর ধাপ বা পর্যায় সমূহ

ক.প্যারেন্ট হুড :

পিতৃত্বও মাতৃত্বেরপ্রথম ধাপ হলো বিয়ে। বিয়ে দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষকে আনন্দ, প্রশান্তি ও প্রবোধ যোগায়। এটি দুজনকে একই ছাদের নিচে বসবাস করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক তা ও ত্যাগের শিক্ষা দেয় ও ধৈর্যশীলতার শিক্ষা দেয়। মানুষ যে ধরনের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায় তার উপরই নির্ভর করে সন্তান কেমন হবে। "সত্যাশ্রয়ী ও বিশ্বাসী নারী পুরুষ তাদের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যক্তিকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে দেখতে চায়। অপরদিকে অসৎ সঙ্গীরা প্রাকৃতিকভাবে একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" সূরা নূর :২৬

বিয়ে হল দুটি মানুষ ও পরিবারের মাঝে জীবনব্যাপী এক প্রতিশ্রুতি। এটিকে খুঁটিও বলা চলে,যার উপর ভিত্তি করে লালিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। একটি বৈবাহিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার জন্য নিম্নুক্ত বিষয়গুলো নিয়ামক হিসেবে কাজ করে :

১,ভালোবাসা ও দয়া

২.সম্মান ও স্নেহ

৩,দৃঢ়তা ও ক্ষমাশীলতা

৪.ন্যায় বিচার ও সমতা

৫.খোলা মন স্বচ্ছতা

৬.সততা ও আন্তরিকতা

৭.পারস্পরিক পরামর্শ

৮.বিশ্বস্ততা

৯.ত্যাগ তিতিক্ষা

১০.কঠোর পরিশ্রম এবং ছাড় দেয়ার মনোভাব

১১.আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

যখন কোন পরিবারে এসব গুণাবলীর সম্মেলন ঘটে এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত হয়।

তখন সেখানে একটি আদর্শিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য খুবই সহায়ক।

পরিবার পরিকল্পনা :

গর্ভকালীন অবস্থা নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য রোমাঞ্চকর একটা সময়। এই মুহূর্তটা দম্পতির জন্য একইসঙ্গে আনন্দদায়ক এবং ভয়ের কারণ।কেননা প্রত্যেক পিতা মাতায় সন্তানের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জন্ম প্রত্যাশা করে। সন্তান জন্মের ব্যাপারে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তাদের পরিকল্পনা ও পর্যায় সম্পর্কে অধ্যয়ন জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রয়োগের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা যা সন্তান জন্ম লাভের পর প্রয়োজন হয়।
গর্ভাবস্থা এমন এক সময় যার অভিজ্ঞতা কেবল নারীরাই পায়। শিশুকে গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে জন্মদান পর্যন্ত একজন নারীকে কষ্ট সহ্য করতে হয়। এ কারণেই ইসলামে বাবার থেকে মায়ের মর্যাদা বেশি। শিশুর জন্ম লাভের পর থেকেই পিতা হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব শুরু হয়।

চক্ষু শীতলকারী ও বরকতময় সন্তান লাভের আশায় পিতা-মাতা এই সময় তাদের চরিত্র ও মূল্যবোধের আবেশ ঘটায়। এজন্য এ সময় পিতা-মাতার উচিত বেশি বেশি দান খয়রাত করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, কুরআন অধ্যয়ন করা, জিকির এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। কেননা একজন মা যা করেন যা
বলেন এবং যা চিন্তা করে তা তারগর্ভে অবস্থিত ভ্রুনকে প্রভাবিত করে এবং তাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা যোগায়।
এছাড়া গর্ভবতী মায়ের মানসিক ওশারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আন্তরিক হওয়া উচিত। তাকে চাপমুক্ত ওভারী কাজ থেকে বিরত রাখা উচিত। এ সময় তার একটি রুটিন থাকা উচিত এবং পরিবারের উচিত তার সেই রুটিন অনুযায়ী চলতে সাহায্য করা।
শিশুর জন্ম লগ্নে ইসলামী রীতি :শিশুর আগমনের সুসংবাদ অন্যান্য মানুষের নিকট পৌঁছাতে হয়। এটি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। মিষ্টি মুখ করানো যেতে পারে,এতে ইসলামে কোন বিধি নিষেধ নেই। পরিবারের নতুন সদস্য আগমনের পর নিম্নুক্ত
বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে :
আজান :সদ্য ভূমিষ্ঠশিশুর ডান কানে আযান দিতে হবে।
তাহ্নিক :আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নিকট আনা হতো। তিনি শুরুতে তাদেরকল্যাণের জন্য দোয়া

করতেন। তারপর তাদের মুখে চর্বিত খেজুরের টুকরা ঘষে দিতেন।"(মুসলিম,আবু দাউদ)

মাথার চুল মুন্ডানো :রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত জন্মের সপ্তম দিন শিশুদের মাথা সম্পূর্ণ মুন্ডন করতেন। তারপর ফেলে দেওয়া চুল ও জন করে সমপরিমাণ সম্পদ দান করতেন।

আকিকা :আকিকা করা সুন্নত। এটি শিশু জন্মের সপ্তম দিনে করা উচিত। ছেলেদের জন্য দুটি এবং মেয়েদের জন্য একটি আমি কুরবানী করা।

সুন্নতে খৎনা :সুন্নতে খতনায় এমন একটি বিধান যা ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে এসেছে অনেকেই জন্মের সপ্তম দিনেই সুন্নতে খতনা সম্পন্ন করতে বলেন।

নাম রাখা :মুসলিম পিতা মাতার কর্তব্য হল সন্তানদের ভালো ও অর্থবহ নাম রাখার চেষ্টা করা। আল্লাহ ও তার গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এবং নবীগণ ওপূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীদের নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানের নাম রাখা উত্তম।

নবাগত শিশুর যত্ন :নবাগত শিশুর দেহ নাজুক প্রকৃতির হয়। একটু অসচেতন হলেই তার বিভিন্ন রোগ হতে পারে। এজন্য মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ধৈর্যশীল ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুকে যত্ন করা উচিত। নবজাতক শিশুরা নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে আশেপাশের বিভিন্ন পরিস্থিতি তারা অবলোকন করে সাড়া দেয় এবং শেখে কার্যক্রমের সময় হাত পা নাড়াচাড়া করে কান্না অথবা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে খুধা, ব্যথা ও মানসিক প্রয়োজনের ব্যাপারে জানান দেয়। তারা নিজের আশেপাশে অসংখ্য ছবি, তথ্য ওঅভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় এগুলো তাদের মস্তিষ্কে পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং এখান থেকে তাদের স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। মূলত তারা কান্নার মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনের কথা জানান দেয়। এজন্য শিশু কান্না করলে বিরক্ত না হয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। পর্যাপ্ত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। ছয় মাস পর বাড়তি পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। তাকে সময় দিতে হবে। তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

শৈশবকাল

টোডলার (১-৪বছর বয়সী শিশু) :শারীরিক ও মানসিকভাবে বড় হওয়ার সাথে সাথে শিশুর পৃথিবী আরো বিস্তৃত হতে থাকে তখন এটা কেবল পরিবার ও পিতা মাতার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনা এ সময় তারা আরো অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হয়। চারপাশের পরিবেশ তাদের মনে নানা ধরনের চিত্র অংকন করে দেয়, যা তাদেরচরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সন্তানদের বাস্তব জীবনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের স্বাভাবিক আচরণে অভ্যস্ত করার জন্য শৈশবকাল থেকেই তাদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিত এটি তাদের নিরাপত্তার জন্যই গুরুত্বপূর্ণঅধিক পরিমাণ বিধি নিষেধ হিতে বিপরীত হতে পারে এক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে খুব জরুরি বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপওহ করা উচিত।

টোডলার শিশুর জন্য ঘরকে নিরাপদ করা আবশ্যক। এ সময়ে শিশুকে তার মত করে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সর্তকতার পরেও এ সময় যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়ম কানুণ শিখে নেয়া এবং উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগানো।

এ সময় তাদের খেলতে দেওয়া উচিত কারণ খেলার মাধ্যমে তারা থেকে

শরীরের অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে তাদের মগজ দ্রুত পরিণত হয় বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে পাঁচ বছর বয়সে শিশুর মস্তিষ্ক বড়দের মস্তিষ্কের তুলনায় দশ ভাগে নয় ভাগ পরিণত হয় সে তাদের শরীর পরিণত হয় বড়দের তুলনায় মাত্র এক কৃতীয়াংশ এই জন্য এই বয়সটা কুরআন মুখস্থ করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সময় মুখস্ত শক্তি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা তবে শিশুরা এই বয়সে যে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে শেখে তা হলো চিন্তা শক্তি তাই তাদের শেখাতে হবে কিভাবে সৃজনশীল উপায়ে ও মুক্ত মনের চিন্তা করতে হয়

শিশুদের মেজাজের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র শিশুরা তাদের পিতা-মাতা ও সহধরদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে গুরুত্বপূর্ণ হল ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেড়ে উঠছে তা আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রকাশ উদযাপন করতে পারছে কিনা সন্তানদের পিতা-মাতার সদৃশ্যতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই

সন্তানদের কার্যকর উপায়ে গড়ে তুলতে হলে মুসলিম পিতা-মাতার অবশ্যই সন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পদ্ধতি শিখতে হবে মধ্যে প্রবেশ করার সক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তির মাধ্যমে কারো অভিজ্ঞতার মধ্যে পরিভ্রমণ করা এক চমৎকার দক্ষতা মানবজাতির সবচেয়ে কার্যকর প্রশিক্ষক মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই টেকনিকে ছিলেন সফলকাম ব্যক্তি

সন্তানদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করতে হবে এমন কোমল স্বরে কথা বলতে হবে এবং মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে তখনই তারা সম্মান করতে শিখবে

শিশুদের জীবনে শুরুতে ইসলামী চেতনার বিষ বন্টন করে দেওয়া এক বছর বয়স থেকেই দুই একটা করে কথা বলতে শেখে এসে তারা প্রায় তাই পিতা মাতার উচিত ছোট ছোট বাক্যে অর্থপূর্ণ কথা বলা তাদের সামনে ভালো মানের ছড়া আবৃত্তি করা আকর্ষণীয় শৈলী বঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছোটগল্প বলা এবং পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনা বলাই তাদের মত বিষয়গুলো শিশুদের আলোকিত করে এবং বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহী করে তোলে শিশুদের ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রকৃতি দেওয়ার ব্যবহার শেখানো একইভাবে পারে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে যদি সালাত আদায় অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে শিশুরাও অবচেতন মনে এই সমস্ত বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।
মহান আল্লাহ তায়ালা স্রষ্টা ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা। ধর্মীয় রীতি-নীতির শিক্ষা দেওয়া।

এই বয়সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়
১.টয়লেট ট্রেনিং এবং স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা : ইসলামে তাহারাত গুরুত্বপূর্ণ ওসালাত আদায়ের পূর্ব শর্ত। জন্ম থেকে শিশুদের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সচেতন হতে হবে। শিশু যখন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে শেখে তখন থেকেই তাদের টয়লেট করার পদ্ধতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা অর্জনের প্রক্রিয়া শিখাতে হবে।
২.খাদ্য :পিতা মাতার কর্তব্য হচ্ছে জন্ম থেকেই সন্তানদের আহার এবং পানীয় দিকে লক্ষ্য করা। খাদ্য শুধু হালাল হলে চলবে না সেটি পুষ্টিকরও সুস্বাদু খাদ্য

কিনা সেদিকেও নজর রাখতে হবে। শিশুদের হালাল-হারামের ব্যাপারে যথাযথ ধারণা দিতে হবে।

৩.ক্রোধ ও হতাশা নিয়ন্ত্রণ :এ বয়সের শিশুরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয় তারা এই সময় বাস্তব পৃথিবীর অনেক কিছুই বুঝতে পারেনা এবং একই সঙ্গে নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতেও হিমশিম খায়। যদি কোনো কারণে হতাশা মানুষিক অস্বস্তি ও রাগ তাদের গ্রাস করে,তবে তারা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে ওহাত পা ছোড়াছুড়ি করে। এজন্য শিশুদের জন্য খাদ্য ও পানিয় নিশ্চিত করা। যেন তারা অতিরিক্ত আবেগী কিংবা শঙ্কিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মাতা যদি সন্তানের সামনে নিজেদের অনিয়ন্ত্রিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের সামনে চিৎকার চেঁচামেচির মত খারাপ উদাহরণ তৈরি করেন, তাহলে এই শিশুরাও এই সমস্ত কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রাত্যহিক জীবনে এমন কতগুলো উপায় অবলম্বন করতে হবে যা তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

৩.ডিভাইস ব্যবহার :বেঁচে থাকার তাগিদে পিতা মাতাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। চাকরি ব্যবসা কিংবা অন্য কোন উপার্জনের কাজে। ফলে সন্তানের সাথে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ডিভাইস শিশুদের সময় কাটানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে। অনেক পিতা-মাতা মনে করেন এগুলো শিশুদের সুস্থ বিনোদন দেয় যা তাদের দীর্ঘ সময় ধরে শান্ত করে রাখে। এ অভ্যাসতাদের অপরের সাথে সাথে মেলামেশা করার, চিন্তাশক্তি অর্জন এবং সৃজনশীলতা থেকে দূরে রাখেএবং তাদের একাগ্রতা নষ্ট করে ফেলে। পাশাপাশি এই ধরনের অভ্যাস তাদের চিন্তা গ্রস্ত করে তুলে এবং চোখ ব্যথা সহ নানান ধরনের শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। শিশুরা স্বভাবতই শারীরিক ও সামাজিকভাবে সক্রিয় হয় তারা খেলাধুলা করতে এবং অপরের সাথে মেলামেশায় আগ্রহী। শিশু সন্তানকে সময় দেওয়ার জন্য এবং তাদের সাথে সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণ করারজন্য সময় নির্ধারণ করা উচিত।

পারিবার ও প্রাথমিক শিক্ষা (৫-১০বছর বয়সী শিশু) :প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর শারীরিক, মানসিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক, আবেগীক বিকাশ সাধন

এবং তাদের দেশাত্মবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতায় উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

এটি পরিবার ও বিদ্যালয়ের একটি সমন্বিত কাজ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে দেওয়া।প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিক্ষা অর্জনের প্রথম সোপন বলা হয়। এ পর্যায়ের শিশুকে ফুলের কলির সাথে তুলনা করা চলে।

"আমি তোমাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও তত্ত্ব জ্ঞান আর শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না। "সূরা বাকারা **১৫১**। উপরের আয়াত থেকে বোঝা যায় শিক্ষার জন্য ওস্তাদ বা শিক্ষকের প্রয়োজন। একজন আদর্শ শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের ঢেলে সাজাতেপারেন। শিক্ষার্থী তার আদর্শকে অনুসরণ করে।যা তার জীবনের পরবর্তী ধাপ পেরুতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

প্রাথমিক স্কুল বা মাদ্রাসা বাছাই :

এই বয়সে সন্তানরা কী উপায়ে শিক্ষা অর্জন করবে তা বাছাই করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটা তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সাধ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী পছন্দ সই যেকোনো বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় সন্তানকে ভর্তি করানো। মাঝেমধ্যে সন্তানরা কেমন পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করছে তা দেখার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা ভিজিট করা। শিক্ষক বা ওস্তাদদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। বাসস্থান থেকে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসার দূরত্ব বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানো উচিত।

স্কুল বা মাদ্রাসা জীবন শুরু :

স্কুল মাদ্রাসা জীবন শুরুটা শিশুদের জন্য খুবই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কারণ এরমাধ্যমে তাদের স্বাধীন শৈশব জীবনের শুরু হয়। এখানে নানা ধরনেরশিক্ষা এবং বন্ধু তৈরির অনেক সুযোগ পায়। কিছু কিছু শিশু স্বাচ্ছন্দের সাথে স্কুলে যাওয়াকে উপভোগ করে। আবার কিছু শিশু ভয় পায়। এ সময় অভিভাবককে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসার পরিবেশের সাথে শিশুদের খাপ খাওয়াতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

শিশুদের মধ্যে যেসব সমস্যা দেখা দেয় :

ক.বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা ভীতি:নতুন কিছুতে ভয় পাওয়া মানবীয় চরিত্রের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এটা দীর্ঘস্থায়ী নয়। শিক্ষক ও পিতা-মাতার উচিত এর কারণ খুঁজে বের করা। অনেক সময় শিশুরা মাকে ছাড়া দূরে থাকতে চায়না। নতুন মানুষকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনা। এজন্য পিতা মাতার উচিত তাকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, প্রচুর ভালোবাসা দেওয়া। শিক্ষককেও শিশুর চাহিদা ও আবেগ বুঝে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

হেনস্তার শিকার :কিছু ছেলে মেয়ে প্রচুর হইহুল্লোড় করতে ভালোবাসে। কিছু আছে নির্জনবাসী।দুরন্ত ছেলেমেয়েরা অনেক সময় আক্রমণাত্মক ও হতে পারে। তারা নিরীহ শিশুদের হেনস্থা করে। এটি মৌখিক, মানসীক কিংবা শারীরিক যে কোন ধরনের হতে পারে। এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হলে অভিভাবকের উচিত বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের সাথে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা।

আত্মসম্মানবোধের সংকট :সন্তানদের আত্ম সম্মানবোধ বাড়ানোর ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবদান সবচেয়ে বেশি। পিতা-মাতা যদি তাদের স্নেহ করেন, তাদের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলেন, তাদের অর্জন গুলোর স্বীকৃতি দেয় তাহলে তাদের আত্ম সম্মানবোধ বাড়ে। কারো সামনে তাদের অপমান করা ঠিক নয় আড়ালে বুঝিয়ে বলা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

আচরণগত সমস্যা :শিশুরা সাধারণত চায় তাদের আশেপাশের মানুষগুলো সব সময় তাদের অনেক ভালোবাসুক, তাদের ভালোভাবে গ্রহণ করুক। তাদের সাথে সংবেদনশীল আচরণ করুক। যদি কোন কারনে তাদের মনে হয় তাদের পিতা-মাতা বা শিক্ষকরা কথা শুনছেনা, তাদের মূল্যায়ন করছে না, তাহলে তারা নিজেদের প্রত্যাখ্যাত মনে করে।শিক্ষক ও অভিভাবকের উচিত তাকে ধমক ও তুচ্ছ তাচ্ছিল না করে শিশুর আচরণগত সমস্যার কারণ খুঁজে বের করে তার সমাধান করার চেষ্টা করা ।

প্রতিভাধর সন্তানদের জন্য চ্যালেঞ্জ :সন্তানরা যদি প্রতিভাবান হয় তাহলে পিতা-মাতা তাদের নিয়ে গর্ব করেন। তাদের পিতা-মাতার মনে রাখা উচিত প্রতিভা আল্লাহর একটি বড় নেয়ামত। একে কল্যাণকর কাজে লাগানো উচিত।তারা মনে করে মেধাবী সন্তানরা সব বিষয়েই পারদর্শী হবে। এজন্য তারা সন্তানেরসফলতারজন্যভালো ফলাফলের দিকে গুরুত্ব বেশি দেন। তারা

করে মনে করে মেধোবী সন্তানরা সব বিষয়েই পরিপক্ক হবে। তারা ভুলেই যান বাচ্চাদের অনুভূতির সংক্রান্ত ওমনস্তাত্ত্বিক চাহিদার কথা।

যা তাদের সফল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। উদাহরণ হিসেবে ফাতিমা আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি পশ্চিমা বিশ্বে জন্মগ্রহণ করেও একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। এর অবদান সম্পূর্ণই তার পিতা মাতার।

শেখার ক্ষেত্রে সমস্যা :আমাদের সমাজে শারীরিক ওমনস্তাত্ত্বিকভাবে সমস্যা গ্রস্ত শিশু রয়েছে। যেমন, কেউ কানে কম শুনে, কেউ চোখে কম দেখে, কারো বুদ্ধি কম, কেউ কথা কথা বলতে পারেনা, কেউ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেনা এদের বলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। পিতা-মাতা শিক্ষকের এদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। প্রয়োজনে এদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় বা শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

রূঢ় ভাষা:"সে সকল বিশ্বাসীরা সফল হয়েছে যারা তাদের নামাজে বিনয়ী এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। "সূরামুমিনুন :১-৩

মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করার ক্ষেত্রে ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। এর দ্বারা একজন মানুষের চরিত্র ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটে। মুখের ভাষা ভালো হওয়ায় একজন মানুষ যেমন মহান আল্লাহ তাআলার ও মানুষের খুব কাছের মানুষ হতে পারে , তেমনি মুখের ভাষা খারাপ হওয়ার কারণে সে মহান রব ও মানুষের শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আমাদের উচিত সুন্দর ও শালীনভাবে শিশুদের সাথে কথা বলা। দুঃখজনক ভাবে বর্তমানে মূল্যবোধ হীন আধুনিক সংস্কৃতির ও প্রভাবে শালীন ভাষা সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে। বর্তমানে রাস্তা ঘাটে,

অনলাইন দুনিয়ায়, খেলার মাঠে নিষিদ্ধ ভাষার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। এজন্য পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

পারিবারিক পরিবেশ :

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন।"সূরা নাহল:৮০

বিদ্যালয় হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র; যা মানুষকে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে সাহায্য করে। শিশুর জীবনে পরিবারই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নোঙ্গর। পরিবার এমন স্থানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত যেখানে পিতামাতা ভালো কাজের ও নৈতিকতার নেতৃত্ব দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে একটা শিশু বড়ো হওয়ার পর্যন্ত তার শারীরিক মানসীক নৈতিক ও ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে।যে দায়িত্বের শুরু হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে। পরিবারকে শিশুর ব্যক্তিগত ও চারিত্রিক উন্নতির বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া জরুরী।

শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিবারের কর্তব্য :
"সেদিন সম্পদ ও সন্তান কোন কাজে আসবেনা; শুধু পবিত্রও পাপমুক্ত আত্মা ছাড়া।"সূরা আশ-শুআরা:৮৮-৮৯
পরিবারে পিতা মাতাকে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে সন্তানরা সহজে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন, বিশ্বাসের চর্চা এবং আমল করতে পারে। এজন্য অভিভাবককে শিশুদের যেসব ইসলামী আদব শেখানো উচিত, সেগুলো হলো-

অভিবাদন : সন্তানকে সালাম দেওয়া এবং সালামের জবাব দেওয়ার উত্তম উপায় শেখানো এবং সৌজন্যতা বোধ শিখানো উচিত।

অনুমতি : অন্য কারো রুমে কিংবা বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি নেয়ার কৌশল শেখানো।অথবা কারো জিনিস ধরার আগে তার অনুমতি নেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

কথা বলা : নিচু স্বরে কথা বলা, বড়দের ইজ্জতের সাথে সম্মোধন করা। কথা বলার সময় মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা ক্ষেত্রবিশেষে ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, ইত্যাদি ইসলামিক শব্দগুলো ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা।

অঙ্গীকার রক্ষা : যত ছোট অঙ্গীকারই হোক না কেন অভিভাবকদের পূরণ করা কর্তব্য। সন্তানদের সাথে তাদের কখনোই এমন ওয়াদা করা উচিত নয়, যা তারা পূরণ করতে পারবে না। শিশুদের সান্তনা দেয়ার জন্য কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া উচিত নয়।

সাময়ানুবর্তিতা : অভিভাবকদের উচিত তাদের প্রত্যেকটা কাজ সময় মত করা।যেমন ;বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া, নামাজ পড়া, দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।।

খাওয়া ও পান করা : একটা পরিবারের জন্য এটা খুব ভালো অভ্যাস যে প্রতিবেলা খাবারের শুরুতে দোয়া পাঠ করে খাবে।হালাল খাবার ও সুষম খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হতে হবে এবং পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে হবে।

ভালো আচরণ : হাঁটার ক্ষেত্রে নম্রভাবে হাঁটা,শেয়ার করে খাওয়া, আরেক জনের সামনে ফিসফিস করে কথা না বলা, হাসিমুখে থাকা, দৃষ্টি নত রাখা, কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা না বলা , কারো দুর্বল বিষয় প্রকাশ্যে না বলা ইত্যাদি বিষয়গুলো একজন মুসলিমের চরিত্র। এই বিষয়গুলো সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া। এছাড়া পিতা মাতা পরস্পরের সাথে উত্তম আচরণ করবে। এর প্রভাব সন্তানের উপর পড়বে।

পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। অনেক ইবাদতের প্রথম শর্ত হচ্ছে পবিত্রতা।পবিত্র ও পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন থাকলে দেহ ও মন সুস্থ ও ভালো থাকে।

'আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবংতাদেরও যারা নিজেদের পবিত্র করে। 'সূরা ওয়াকিয়া :৭৭ -৭৯

শারীরিক পবিত্রতার মধ্যে রয়েছে ওযু করা, নিয়মিত গোসল করা, হাতের নখ কাটা চুল কাটা, ব্রাশ মিসওয়াক করা জামা কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি। এসব বিষয়গুলো শিশুদের সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে করানোর অভ্যাস গড়ে তোলা।

সংযম : আমাদের মুসলিমদের জীবনযাপনে অর্থ সময় শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

"তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করেনাএবং কার্পণ্য ও করে না বরং প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। "সূরা ফুরকান: ৬৭

অর্থাৎ সামর্থ্য থাকলেও শিশুদের অন্যায় আবদার মেনে নেয়া যাবেনা। প্রয়োজন অনুযায়ী তার চাহিদা পূরণ করতে হবে।

লজ্জা : লজ্জা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হযরত মুহাম্মদ (স:) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লজ্জাশীলতা ছিল অন্যতম।

"অশ্লীলতা সবকিছুকে বিকৃত করে, আর হায়াবা লজ্জা সবকিছুকে আকর্ষণ করে"। তিরমিজি

লজ্জাহীনতা সমাজে যৌনতা ছড়ায়।তাই আমাদের উচিত শিশুদের লজ্জাশীল করে গড়ে তোলা।এটা বর্তমানে একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু পিতা-মাতা পশ্চিমা কালচার অনুসরণ করে নির্লজ্জ হয়ে চলাফেরা করে। এদের সন্তানরাও তাদের মতোই জীবনযাপন করে, ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশ্লীলতা দ্রুত ছড়িয়ে পরছে। সচেতন পিতা-মাতার সন্তানদের এ ব্যাধি থেকে বাঁচাতে হলে কিছু পন্থা অবলম্বন করতে হবে-

১. ১০ বছর বয়স হলে সন্তানদের বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।

২. পরিবারের সদস্যদের উচিত একে অপরের সামনে পোশাক পরিধান কিংবা খোলা থেকে বিরত থাকা।

৩. সাত বছরের উপরের শিশুদের একসঙ্গে গোসল করতে না দেয়া।

৪.শিশুদের সব সময় প্যান্ট পরিয়ে রাখা এবং তিন বছর বয়স হলে প্যান্ট পরিয়ে গোসল করানো।

৪. টিভিও মোবাইলে অশালীন প্রোগ্রাম দেখায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা।

৫.কারো সাথে অশালীন আলোচনা থেকে বিরত রাখা।

৬.স্বামী স্ত্রীর রোমান্স শিশুদের সামনে প্রকাশ না করা।

শিশু মানসে ঔশৃংখলতা: কারণ ও প্রতিকার

পরিপূর্ণ ইসলামিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা সত্বেও পুরো সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে শিশুদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়।এজন্য নিজ পরিবারে কিছু আচরণ গত সমস্যা দেখা দেয়।সব শিশুকে একই পদ্ধতিতে লালন পালন করা সম্ভব হয় না। শিশুর চাহিদা ও আচরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। যেমন- কোন শিশু মা-বাবার খুব বাধ্য হয়, আবার কোন কোন শিশু জেদি ওউশৃংখল হয়।

উশৃংখলতার কারণ ও প্রতিকার :

বেশিরভাগ শিশুররা মা-বাবার অজ্ঞতার কারণে উশৃংখল হয়ে থাকে। তবে প্রকৃতগতভাবেও হতে পারে। নিম্নে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হল -

বোধ, বিশ্বাস, শিক্ষা ও দর্শন :অনেক পরিবারে মায়ের সাথে পরিবারের সবাই খারাপ আচরণ করে। সন্তানও মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করে সে বিশ্বাস করে মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করা স্বাভাবিক ঘটনা। সন্তানকে একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উচিত মাকে সম্মান করা।।

দাম্পত্য সম্পর্কে অস্থিতিশীলতা :অনেক পরিবারের জীবনের প্রয়োজনে ব্যস্ততার কারণে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। এর প্রভাব সন্তানের ওপর পরে। এতে অনেক সময় একজন আরেকজনের রাগ সন্তানের উপর ফেলে। এর প্রতিক্রিয়া সে বিদ্যালয়ে কিংবা বন্ধুদের মাঝে প্রকাশ ঘটায় এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে পিতা মাতাকে স্থিতিশীল আচরণ করতে হবে এবং একজন একজনের বিশ্বাস ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে হবে।

খাদ্য ও পানীয় : জীবনযাপনের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। শরীরে খাওয়ার চাহিদা হলে ক্ষুধা লাগে। ক্ষুধা লাগলে বাচ্চা খেতে চাইবে। বাচ্চা যদি বাইরের জিনিস না খায় এবং তার মন মত খাবার তার ইচ্ছেমতো পরিবেশে দেয়া যায় তবে সে খাবে। কিন্তু বর্তমানে পিতা-মাতা শিশুকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করে। এতে খাওয়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। এছাড়া বর্তমানে বাইরের খাবারের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বেশি এসব মুখরোচক ও অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং পানীয় শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি পরে। শিশুদের রুটিন অনুযায়ী সুষম খাবারের অভ্যাস ঘরে তুলতে হবে

ঘুম ও বিশ্রাম : মানুষের সুস্থতার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ঘুম ও বিশ্রাম। বর্তমানে রাত জেগে অনলাইনে ব্যস্ত থেকে দিনে ঘুমানো একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ(স:)তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যেতেন আবার শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জত নামাজ পড়তেন। এ নিয়মের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে।রাত

এগারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত সমায়ে মধ্যে ঘুম কে ডেলটা স্লিপ বলে।এ সময় শিশুদের ডেভেলপ হয় কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি খুব কম পরিবারের এ নিয়ম বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া শিশুদের মোবাইল আসক্তির কারণে তারা খেলাধুলা ও কায়িক শ্রম করে না। ফলে তাদের দেহে ক্লান্তি আসে না। একারণে তারা দেরিতে ঘুমাতে যায় এবং দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে।

অবসর ও বিনোদন : অবসর ও বিনোদন শিশুর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের জন্য অপরিহার্য। কিছু পিতা-মাতা শিশুদের অতিরিক্ত পড়ার চাপে রাখেন, খেলাধুলা করারও সময় দেন না এতে তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে অসচেতন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে রাখেন। এসব সন্তান তাদের ইচ্ছামত সময় অতিবাহিত করার কারণে তাদের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সচেতন পিতা-মাতার উচিত মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

কৈশোরের কৌতুহল ও কোলাহল

"আল্লাহ তাদের কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে সম্মোধন করেন এই কারণে যে, তারা তাদের পিতা-মাতা ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল। পিতা মাতার প্রতি ঋণী থাকার কারণে তাদের প্রতি যেভাবে তোমার দায়িত্ব রয়েছে, একইভাবে সন্তানদের প্রতি ও তোমার দায়িত্ব রয়েছে।"- আল আদাবুল মোফরাদ, বুখারী

১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সি শিশুদের কিশোর বলা হয়। তারা যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিন্তা করার এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঠিক শব্দ ও বাক্যাংশ অনুসন্ধান করতে শুরু করে। তারাএকটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ চিন্তা করার জন্য যথেষ্ট পরিণত হয়ে থাকে। এটি এমন একটি সময় যখন মানুষ তার শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করে এবং দূঃসাহসী কিছু করার আশা পোষণ করে। এ সমস্ত শক্তি যদি আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ইতিবাচক সামাজিক আচরণ দ্বারাপরিচালিত হয় তাহলে এই গতিশীলতা সমাজকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়; কিন্তু পথভ্রষ্ট কৈশোর একটি ধ্বংসাত্মক শক্তি,যা সমাজকে টেনে নিচে নামিয়ে আনে এবং সমাজে বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

ইসলামকে পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে প্রতিটি যুগে তরুণরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা নিজের মানবিকতা, ভাবাবেগ, প্রাণশক্তি ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে।

কিশোররা তাদের শক্তি -সামর্থ্য ব্যয় করার স্পৃহা তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের থেকে শেখে। তাই অভিভাবকদের উচিত কিশোর সন্তানদের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রাখা।যাতে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণার্থে তাদের একজন ভালো মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এজন্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা যাতে তারা মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন হয় এবং নিজেকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

বিরাট পরিবর্তন

শিশু যখন শৈশব থেকে কৈশোরের দিকে পদার্পণ করতে শুরু করে তখন শারীরিকও আবেগিকভাবে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এ সময় তাদের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। এ সময়েই মূলত অভিভাবকদের সন্তান লালন পালনের সক্ষমতা যাচাই হয়। বিবেকবান পিতা-মাতা ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে সন্তানদের সাথে আচরণ করেন এবং তাদের আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে বিবেচনা পূর্বক নিজেদের মানিয়ে নেয়।

শারীরিক পরিবর্তন :মেয়েদের ক্ষেত্রে স্ত্রী হরমোনের বৃদ্ধি তাদের শরীরকে একজন পরিপূর্ণ নারীর গঠনে রূপান্তরিত করে এবং তাদের মধ্যে হায়েজের সূত্রপাত ঘটে। ছেলেদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয় এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পুরুষালী বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সঙ্গে বয়সন্ধিকালের গুরুত্বপূর্ণ দিক সমূহ নিয়ে যথাসম্ভব খোলামেলা ভাবে আলোচনা করা। এর মধ্যে ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী ঋতুস্রাব ও স্বপ্নদোষের পর পবিত্রতা অর্জন, শরীরে অবাঞ্চিত লোম পরিষ্কার সহ বিভিন্ন ইসলামিক আচার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অনুভূতিগত পরিবর্তন : শারীরিক পরিবর্তন কিশোরদের মাঝে প্রাকৃতিক ভাবেই লজ্জাশীলতা ও বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে।
শরীরে হরমোনজনিত কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়।
সচেতন অভিভাবক ও বড়রা বাস্তব পৃথিবীর সাথে মানিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের উপর অধিক চাপ প্রয়োগ করে না বরং তারা যাতে নিজের মতো নতুন পৃথিবীর সাথে মানিয়ে নিতে পারে সেজন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ করে দেয়।

সামাজিক পরিবর্তন : এ সময় নিজের পায়ে দাঁড়াতে ভোর হওয়ার একটা তাড়না অনভব করে। এটা করতে গিয়ে তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করে সসেটা অনেক

সময় পরিবারের সাথে সাংঘর্ষিক। পারিবারিক কার্যক্রমকে তারা বিরক্তিকর মনে করে, ছোট ভাই বোনও বড়দের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। বড়দের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। দামি জিনিসপত্র কিনে দেয়ার জন্য অভিভাবকদের চাপ প্রয়োগ করে ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি করে

এ সময় অভিভাবকদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। শিশু কোন বয়সে কেমন আচরণ করে সে সম্পর্কে সচেতন অভিভাবকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ বয়সে কিশোররা অতিমাত্রায় আবেগপ্রবন হয়ে থাকে তাই তাদের বকাঝকা না করে বন্ধুসুলভব আচরণের মাধ্যমে সন্তানদের সঠিক পথ প্রদর্শন করা।

অন্যান্য বিষয়

যৌনতা : যৌনতা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টির একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বয়সন্ধিকালের প্রভাবে কিশোর কিশোরীরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ব্যাপক আগ্রহী হয়। এ সময় অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। পিতা-মাতার অসচেতনতা ও অসাবধানতার কারণে ছেলে মেয়ের জীবনে বিপর্যয় আসতে পারে। নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট শিষ্টাচার। মুসলিম পুরুষ ও নারীদের বলা হয়েছে -"আচার-আচরণে বিনয়ী হতে দৃষ্টিকে অবনত রাখতে এবং বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে না এমন পোশাক পরিধান করতে "।(সূরা নূর :৩০ - ৩১)

পর্দা ও শালীনতা :পর্দা নারীকে সম্মানের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। পর্দা নারীদেরকে পুরুষের অশ্লীল দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে পুরুষদেরও সাহায্য করে নারীদের সৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত হওয়া থেকে। সুতরাং পিতা মাতাকে অবশ্যই এ বয়স থেকেই মেয়েদের পর্দাকরার অভ্যাস গেড় তুলতে হবেএবং পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। তাহলেই একটি সুস্ঠ সমাজ গড়ে উঠবে।

দাড়ি : এ বয়সে অধিকাংশ কিশোরেরই দাড়ি উঠতে শুরু করে। দাড়ি রাখা প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা গোঁফ ছোট করো দাড়ি ছেড়ে দাও। "সহীহ মুসলিম
দাড়ি রাখা হল নবী-রাসূলগণের সুন্নাহ যা পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষদের উপর ওয়াজিব। সুতরাং পিতা মাতাকে সন্তানকে দাড়ি রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

বন্ধুত্ব সাহচর্য :কিশোর জীবনে উন্নত চরিত্র গঠনের অন্যতম উপাদান হলো উত্তম সাহচর্য। উত্তম বন্ধু বাছাই করার ক্ষেত্রে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বন্ধু হচ্ছে স্বচ্ছ আয়না স্বরূপ। কিশোর বয়সে মা বাবার তুলনায় বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা প্রকট হয়। এজন্য বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। মা-বাবাকে খেয়াল রাখতে হবে সন্তান কোনধরনের ছেলের মেয়েদের সাথে চলাফেরা করে। অসৎ সঙ্গের কারণে ছেলে মেয়ে মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে পিতা মাতাকে কঠোর হতে হবে।

অরুচিকর স্টাইল ও ফ্যাশন : অরুচিকর স্টাইল ও ফ্যাশন বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কিশোররা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এবং সমাজের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য এ অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়েছে। এছাড়া বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য ওতারা এর অনুকরণ করে। মূলত ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে এবং পরিবারের দুর্বল প্যারেন্টিং এর অভাবে তারা এ পথ বেছে নেয়।

অবাধ্যতা বিদ্রোহী মনোভাব : প্রায় ক্ষেত্রেই কিশোররা নিজের ভেতরের হতাশাও ক্রোধকে স্পষ্ট করে বলতে পারেনা। ফলে তাদের রাগের মাধ্যমে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহী আচরণের প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা চিন্তিত হয়ে পড়েন। অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে রাগারাগি করেন। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। এ সময় অভিভাবকদের মাঝে সহিষ্ণুতা রাগ প্রশমনও নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে। সন্তানদের সাথে সব সময় খোলামেলা আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষা

করা জরুরী। এছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করা উচিত যদি তা যুক্তিসঙ্গত হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহনন : কিশোররা জীবনের কঠিন মুহূর্তে যদি যথাযথ সমর্থন কিংবা সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা না পায় অথবা তাদের চাওয়া-পাওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তারা আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদের ক্ষতি সাধন করে এবং নিজেকে দোষ দিতে থাকে। বিভিন্ন কারণে তারা এ কাজ করে থাকে। যেমন :অবহেলার শিকার হওয়া। ভালোবাসার মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া। হুমকি বা নির্যাতনের শিকার হওয়া পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হওয়া। যেকোনো কারণেই হোক, আত্মহত্যা মহাপাপ। "আল্লাহ বিপদের মাধ্যমেমানুষের পরীক্ষা নেন এবং বিপদে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য বিশাল পুরস্কার ধার্য করেন।" (সূরা বাকারা ১৫৫ -১৫৬)

ধৈর্যশীলতা আসে আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস থেকে যা ইসলামের যথাযথ জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে তৈরি হয়।এর ফলে ব্যক্তি আল্লাহর যেকোনো সিদ্ধান্তকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে। মুসলিম পিতা-মাতা যদি আদর - যত্ন ও বোঝাপড়ার মাধ্যমেসন্তানদের লালন-পালন করে, তাহলে ইনশা আল্লাহ নিজের ক্ষতি করার বিষয়টি কোনভাবেই তাদের মাঝে আসবে না। সন্তানদের কঠিন মুহূর্ত ও হতাশা জনক অবস্থা মোকাবেলায় অভিভাবকদের জিম্মাদারী গ্রহণ করা জরুরী। এর জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়াও যেকোনো পরিস্থিতি গ্রহণ করার যোগ্যতা এবং সহিষ্ণু করে সন্তানদের করে গড়ে তুলতে হবে।

খাদ্য গ্রহণে অস্বাভাবিকত্ব : খাদ্য গ্রহণের সাথে মানসিক বিষয় জড়িত। মানুষ যে সময়ে প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণ করে সে সময়েই তার ক্ষুধার তাড়না সৃষ্টি হয়। তাই খাবার খেতে হয় মনোযোগ দিয়ে কিন্তু বর্তমানে ছেলে মেয়েরা মোবাইল ও টিভি দেখে খাবার গ্রহণ করার ফলে তারা কি খাচ্ছে কতটুকু খাচ্ছে তার কোন পরিমাণ ঠিক থাকে না। অথবা মোবাইলের নেশায় সময় মত খাবারও গ্রহণ করেনা। এর ফলে খাদ্য গ্রহণে অস্বাভাবিকত্ব দেখা দেয়এবং এতে তারা স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে।

এছাড়াও কিশোরী মেয়েরা স্লিম থাকার জন্য ডায়েট কন্ট্রোল করে। এর কারনে তারা বিভিন্ন শারীরিক মানসিক সমস্যারও সম্মুখীন হয়।
অভিভাবকরা পরিবারে হালাল ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করবে। ভারসাম্যপূর্ণ ডায়েটের ব্যবস্থা ও করতে পারেন। সন্তানদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং সবাই মিলে একসাথে বসে সুন্নত তরিকায় খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়েতোলার চেষ্টা করবেন।

বিদ্যালয় ও ক্যারিয়ার

ছেলেমেয়েরা যখন বয়সন্ধিকালে পৌঁছায় তখন তাদের অধিকাংশ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করে।এটি তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের শুরু। সন্তানদের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা দুটানায় পড়ে যান। এই বিষয়ে তাদের অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।
পিতা-মাতার কর্তব্য হল নিজেদের সামর্থানুযায়ী সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা। আশেপাশের এলাকায় কম দূরত্বে অবস্থিত সামর্থের মধ্যে ভালো মানের সমৃদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অভিভাবকদের প্রথম পছন্দ। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষায় এবং বর্ণবাদ ও ইসলাম ভীতি দূরীকরণে যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্বাসযোগ্যতা নেই সেগুলো এড়িয়ে চলা।
বাছাইকৃত বিদ্যালয় অবশ্যই এমন একটি স্থানে ও পরিবেশে অবস্থিত হতে হবে, যা সন্তানদের একটি সফল এবং উপযুক্ত ক্যারিয়ার অর্জনে উৎসাহিত করে। কোন অভিভাবক যদি সন্তানদের পড়াশোনায় সাহায্য করতে অপারগ হয় সেক্ষেত্রে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যধিক।

একজন তরুণ ক্যারিয়ার এর শুরুতে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা তার পরবর্তী জীবনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সকল সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম তরুণদের শুধু বৈষয়িক সফলতা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখলেই হবে না; তাদের উচিত এমন কেরিয়ার বাছাই করা যা তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হালাল উপার্জনে

সহায়তা করবে। সমাজকে কিছু দেওয়া সমাজের উপকারের জন্য কিছু করা এবং এর সকল পরকালীন জীবন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা
করার দিকে সবার আগে নজর দেয়া উচিত।

এ সময় কিশোরদের যেসব নিয়ম কানুন মেনে চলা উচিত -

১.পড়ার রুটিন তৈরি করা

২.অতিরিক্ত রাত না জাগা

৩.সঠিক সময়ে খাবার গ্রহণ করা

৪.সৎ ও মানবিক বন্ধু নির্বাচন করা

৫.নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করা

৬.ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা

৭.শিক্ষকদের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা থাকা

৮.সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সংযুক্ত করা

৯.পিতা-মাতার প্রতি অনুগত থাকা ও নিজেদের সমস্যা ব্যাক্ত করার সাহস থাকা।

১০.ডিভাইসের প্রতি আসক্ত না হওয়া।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানের মেধা অনুযায়ী তাদের নিকট ফলাফল প্রত্যাশা করা। অনেক সময় পিতা-মাতা সন্তানের সাধ্যতাতিত ফলাফলের আশা করেন। এ কারণে তারা সন্তানদের প্রতি পড়াশোনার বিষয়ে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করেন এর ফলে সন্তান হতাশায় ভোগে এবং পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সুতরাং পিতা মাতার কর্তব্য বড়ো অফিসার কিংবা ডাক্তার- ইঞ্জিনিয়ার বানানো নয় তাকে একটি আদর্শ ও মানবীক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই হলো আসল উদ্দেশ্য।

ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়ার কারণ :

১উত্ত্যক্ত ও হুমকি : এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি শ্রেণিকক্ষেও ঘটে যেমন কোন শিক্ষার্থী কোন অপরাধ করল অন্য শিক্ষার্থী শিক্ষককে বলে দিলে ওই শিক্ষার্থী কে মারার হুমকি দেওয়া হয়, মাঝেমধ্যে হত্যা করারও ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাস্তায় বখাটে ছেলেরা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে তারা প্রতিবাদ করলে তাদের তুলে নেয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে ভয় পায় এবং তাদের শিখন বাধা প্রাপ্ত হয়।

এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অভিভাবকের উচিত সন্তানদের মাঝে আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করা আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো। তারা যেন হেনস্তার শিকার হলে পিতা মাতাকে নিঃসংকোচে জানাতে পারে। এ সমস্যার সমাধান খুবই জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ তবুও বখাটে ছেলেদের পিতা-মাতার সাথে আলোচনা।

সমাজ বিরোধী আচরণ :সকল ধরনের আত্মকেন্দ্রিক ও, অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ড কিংবা যা অন্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে মানুষের উপর যার বিরূপ প্রভাব রয়েছে এবং যা সমাজকে ধ্বংস করে দিতে পারে এমন সমস্ত কর্মকাণ্ডই সমাজবিরোধী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্জনে জটিলতা, সমাজের ব্যর্থতা,মানসিক অসুস্থতা বা প্রেরণার অভাব কিশোরদের মধ্যে সমাজ বিরোধী কার্যক্রমের প্রবণতা তৈরি করতে পারে। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলো হল -

১.প্রকাশ্যে উশৃংখলতা।

২.জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করা।

৩. চাঁদাবাজি করা।

৪.রাস্তায় মাদকদ্রব্য কেনাবেচা করা।

৫.ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ পানীয় গ্রহণ করা।

৭. পাড়ায় মাইক বা বক্স বাজিয়ে নাচ গান করা।

সন্তানদের নিরাপত্তার খাতিরে এ ব্যাপারে অভিভাবকদের দৃষ্টি রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত বাইরে থাকার অনুমতি দেয়া যাবে না। এ সকল পদক্ষেপ তাদের সমাজ বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পথে বাধা হবে এবং তাদের এই ধরনের অপরাধের শিকার হওয়া থেকেও রক্ষা করবে।

কিশোর গ্যাং: সাম্প্রতিক সময়ে কোন কোন এলাকায় মুসলিম তরুণদের মাঝে দলবদ্ধ সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত পিতা-মাতার সন্তানরা এসব গ্যাং এ যুক্ত হয়। এসব পিতা-মাতার সন্তানরা নিজের পরিবারে পারিবারিক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ খুঁজে পায় না। প্রথমদিকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরবর্তীতে পিতা-মাতা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। এসব কিশোরদের দ্বারা সমাজে বিপদজনক ঘটনা ঘটে। এরা খুব দুঃসাহসী হয় এবং বিবেকের তাড়না কম থাকে।

মাদক, অ্যালকোহল ও ধুমপান : অ্যালকোহল, মাদক ও ধূমপানের মধ্যে আসক্তির সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। অনেক তরুন অন্যের অনুকরণে অথবা বড়োদের আহবানে ধূমপান কিংবা নেশা জাতীয় মাদক গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও তাদের চাহিদার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় ঘটলে এবং প্রেমে ব্যর্থ হলে তারা এ পথ বেছে নেয়। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে তাদের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়। যেমন যৌনচর্চা, অর্থ জোগাড় করার জন্য চুরি করা, মিথ্যে বলা ইত্যাদি।

সমকামিতা : বিশ্বব্যাপী সমকামিতা কিংবা সম লিঙ্গের মধ্যে যৌন সম্পর্ক খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু কিশোরদের মধ্যে নয় বর্তমানে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার রয়েছে। অথচ ইসলামে সমকামিতাকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

শিশুকামিতা:শিশুকামিতা একটি অমাণবিক, নৃশংস, জঘন্য অপরাধ। কিশোরদের মধ্যে জৈবিক তারনা জাগ্রত হতে থাকে। এ তাড়না মোবাইল যৌন সুড়সুড়ি মূলক বিভিন্ন ছবি দেখে তারা এ জঘন্য কাজে লিপ্ত হয় । শুধু পরিবার নয় কিশোরদের রক্ষা করতে হলে সমাজও রাষ্ট্রকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পারিবারিক সহিংসতা : কারো প্ররোচনায় হোক অথবা পারিবারিক ও আর্থসামাজিক সমস্যার কারণেই হোক যখন এসব কিশোররা বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে তখন পারিবারিকভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যদের উচিত এসব শিশুদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

মূল্যবোধের অবক্ষয় : অত্যাধুনিক পশ্চিমা সমাজের প্রভাব বর্তমানে আমাদের মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। প্রকৃত মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিকতা ও ন্যায় বিচারের মতো সর্বজনীন মূল্য বোধ গুলো ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ ওআত্মকেন্দ্রিকতার কাছে পরাজিত হচ্ছে। ইসলামিক কৃষ্টি কালচার তাদের কাছে ওল্ড মডেল মনে হয়। যারা এর ধারণ ও লালন করেন তাদেরকে তারা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।

আর্থিক অসচ্ছলতা :বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা কিছু কিছু পরিবারের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কারণ তারা অতি দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। দরিদ্র পিতা-মাতা সন্তানদের পড়ালেখার খরচ বহনে অসামর্থ্য হওয়ায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এ কারণে তারা হীনমন্যতায় ও হতাশায় ভোগে। সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে এরাও ভুল পথে পা বাড়াতে পারে। এজন্য এদের কোন বৃত্তিমূলক কাজে অংশগ্রহণ করানো উচিত। যেমন ; ইলেকট্রিক কাজ, ডেইরিও হর্টিকালচার সেলাই প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

আকস্মিক দুর্ঘটনা :পরিবারেরএকমাত্র উপার্জনকারী আকস্মিক অসুস্থ অথবা মৃত্যুবরণ করলে সেই পরিবারে নেমে আসে ঘোর অমাবস্যা। পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ দিশা হারিয়ে ফেলেন। এই পরিস্থিতিতে তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় অনেক সময় সন্তানকেই পরিবারের হাল ধরতে হয়।

তারুণ্য জীবনের ক্রান্তিকাল (১৮-২১)

কিশোর কৈশোর পার করে যৌবনে পদার্পণ করে। এ সময়টা ছেলে মেয়েদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় তাদের মধ্যে কিছুটা স্থীরতা আসে। নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে অর্জন করার প্রেষণা তৈরি হয়। এ সময় তাদের মধ্যে সঙ্গী পাওয়ার প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। মূলত তারুণ্য হচ্ছে এক ধরনের শক্তি।তবে তাদের সফলতার জন্য কিছু চালিকাশক্তি রয়েছে -

১.প্রেরণা : এই তারুণ্যের সফলতার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে প্রেরণা। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকেই বিপুল সম্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তি চরিত্র ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। একজন মুসলিম হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর জীবনাদর্শই হচ্ছে প্রেরণার মূল উৎস। এছাড়া সচেতন পিতা মাতার অনুপ্রেরণায় তরুণরা সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

আত্মমর্যাদাবোধ : আত্মমর্যাদাবোধ একটি ইতিবাচক জীবন দর্শন যা ব্যক্তির আত্ম সচেতনতা আত্ম বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলে। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি তার জ্ঞান দক্ষতা ও বিবেক দ্বারা প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করে ফলে সে সমাজে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়। সচেতন পিতা-মাতা তাদের বোধ তৈরিতে সহযোগিতা করেন এবং তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেন।

অনুকরণীয় আদর্শ : "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর আস্থা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্বরণ করে।" সূরা আহযাব :২১

অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব তরুণদের মাঝে এক ধরনের অদৃশ্য মনস্তাত্ত্বিক নেতৃত্বের আভাস দেয়। ইসলামের ইতিহাসে অনুসরণীয় আদর্শিক নারী-পুরুষে ভরপুর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল বয়সের মানুষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শিক ব্যক্তিত্ব। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য সন্তানদের সামনে সব সময়

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ও সাহাবাদের চরিত্র উপস্থাপন করা উচিত।

আধ্যাত্মিক প্রশান্তি : মানবজাতির সৃষ্টি এর টিকে থাকা সফলতা পূর্ণরূপে আমাদের পোস্টটা তালার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেককে বিচার দিবসে তার কৃত কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি তাকওয়া ও বিচার দিবসের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসই আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি। আমাদের মাঝে যখন আধ্যাতিকতা বেড়ে ওঠে, তখন তা আমাদের প্রকৃতি, চালচলন, অভিব্যক্তি সহ পুরো জীবনে প্রতিফলিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সাহাবীদের আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন -
"তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় " ।সুরা ফাতহ:২৯

তরুণদের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব

"বিচার দিবসে পাঁচটি বিষয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়া ছাড়া আদম সন্তান এক কদম নড়তে পারবে না। তার জীবন কিভাবে কাটিয়েছে,তার যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছে। তার সম্পদ অর্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে।অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে। "-তিরমিজি

অভিভাবক সব সময়ই অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যান সন্তান যত বড়ই হোক না কেন। নবী-রাসূলগণ ও মহান ব্যক্তিরাও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তাদের গাইড করেছেন ভালো পরামর্শ দিয়ে তাদের পাশে থেকেছেন। এই পরিবেশ মুসলিম সমাজকে আন্তরিকতাপূর্ণ করে তুলে। পবিত্র কুরআনে লোকমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজ পুত্রের প্রতি উপদেশ বর্ণিত হয়েছে যেখানে তিনি পুত্রকে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাতৃত্বপূর্ন আচরণ ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে।

সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন পিতা-মাতার স্বাভাবিক দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। সন্তানদের প্রতি ব্যাকুলতা শেষ হয় না। ভালোবাসা পূর্ণ সম্পর্কের যে বীজ শৈশবে বপন করা হয়,তার ফলাফল পিতা-মাতা পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত ভোগ করেন। আল্লাহর সন্তানদের চোখে পিতা-মাতাকে সম্মানিত করেছেন কারণ তারা সন্তানদের জন্য সবকিছুই করেছেন।

ক্যারিয়ার বাছায়ে পরামর্শ :তরুণরা পরবর্তী শিক্ষা জীবন ও ক্যারিয়ার সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে গোলকধাঁধায় পড়ে যায়।এই কঠিন মুহুর্তে পিতা-মাতা বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়ে তাদের সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় সাহায্য করতে পারেন। এটি প্রতিটি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, লক্ষ্য অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম আগ্রহী তরুণরা কর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। কঠোর পরিশ্রম এবং কর্ম ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে উপরে উঠতে পারে। অপরদিকে যারা শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী তাদের কর্তব্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রেএমন সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করা যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় ।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষের সফলতা দুই ধরনের। একটা হচ্ছে দুনিয়ার, আরেকটা আখিরাতের। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্মানজনক উপায়ে হালাল উপার্জন করাই দুনিয়ার সফলতার চাবিকাঠি। সফল পিতা মাতা তারাই যারা সন্তানদের মধ্যে এমন ঈমানের বীজ বপন করে দেন। যা হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন কিছুর সাথে আপোষ করে না।তা যতই প্রলোভনমূলক হোক না কেন। তারা সন্তানদের দেখায় নিজের যোগ্যতা বিকাশের পথ যাতে তারা মেধার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে।

পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সন্তানদের প্রতি অহেতুক চাপ দেওয়া কোনভাবেই কাম্য নয়। তাদের উচিত হারাম হালাল বিষয়ে সন্তানকে সচেতন করা।

বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান অর্জনের এক মহাসমুদ্র :

শিক্ষা একটা জাতির মেরুদন্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্তমান চ্যালেঞ্জিং বিশ্বের সামনে সীমাহীন দ্বার খুলে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে নতুন নতুন আবিষ্কার, গবেষণা,

সৃষ্টিশীলতা ও মৌলিক জ্ঞান অর্জনের জায়গা। রাষ্ট্রের কল্যানার্থে তারা দক্ষ জনবল চমৎকার চিন্তা এবং বাস্তব কর্মপন্থা সরবরাহ করে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিশ্বব্যাপী প্রসারেরযুগে মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ রয়েছে। যুগে যুগে মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা আবিষ্কারের মাধ্যমে ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

দাওয়াতি কাজের সুযোগ : শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সি মানুষ তরুণদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের সুললিত ভাষা ও কণ্ঠের দীপ্ততা মানুষকে আকর্ষিত করে। তাদের এ গুণ তারা দাওয়াতী কাজে ব্যবহার করতে পারে। ইসলামী কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশ্ব দরবারে প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মূর্খও অজ্ঞ মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আনার চেষ্টা করতে পারে।

উত্তম সঙ্গী নির্বাচন : পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি বর্তমানে সন্তানদের ক্যারিয়ার গড়ার পিছনেই তাদের যৌবনের বেশিরভাগ সময় চলে যায়। আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়ের অভিভাবক ছেলে প্রতিষ্ঠিত না হলে মেয়েকে বিয়ে দিতে চান না। এজন্য বিয়ে বর্তমানে কঠিন বিষয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সন্তানদের চরিত্র ঠিক রাখা হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে পুরুষকে দৃষ্টি সংযত রাখা এবং মহিলাদেরকে পর্দায় থাকার বিধান রয়েছে। চরিত্রও জিব্বার হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। যদিও কার সাথে কার বিয়ে হবে সম্পূর্ণই মহান আল্লাহ তায়ালার লিখনীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা।

তবুও আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে দ্বীনদার পাত্র পাত্রি প্রার্থনা করা। দ্বীনদার পাত্র-পাত্রী ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্যই কল্যাণকর।

উপসংহার

"যারা তওবা করে, উপাসনা করে, আল্লাহর প্রশংসা করে, রোজা রাখে, রুকু ও সিজদা করে সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে আর আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলে,তুমি সেই বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও। "(সূরা তওবা ১১২)

সন্তান লালন পালন যদিও একটি কঠিন কাজ তবুও এরমধ্যে রয়েছে প্রশান্তি, আবেগ অনুভূতি,প্রাপ্তির আশা, ভরসা ইত্যাদি।
মুসলিম প্যারেন্টিং একটি ভরসা ও প্রত্যাশার স্থান। একজন মুসলমান কখনো হতাশ হয় না। যে কোন কাজ সে ধৈর্য ও তাকওয়ারসহিত করে থাকে। মুসলিম পিতা মাতা সব সময় আল্লাহর নিকট কল্যাণকর ও বরকতময় সন্তান লাভের আশা করেন। এবং সে অনুযায়ী আমল করেন।
সার্থক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বয়স অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রতি সহমর্মী, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল আচরণ করেন। প্রয়োজনে কঠোরতার পন্থা অবলম্বন করেন। তারা তাদের পারিবারিক পরিবেশকে আস্থা ভাজন, নিরাপদ ও প্রশান্তির পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলেন। তারা শিশুর মস্তিষ্ক ও মননে পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার যে বীজ বপন করেন, তার ফলাফল তারা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উপভোগ করেন।

নোট :

১.মুসলিম পেরেন্টিং(সন্তান প্রতিপালন গাইড) ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারি।
২.ডক্টর জিয়াউল হক এর বক্তৃতা।
৩.কোরআনের আয়াত।
৪.বুখারী ও মুসলিম শরীফ।